দৈনিক ইনকিলাব

021

তারিখ 07 JUN 1987
পৃষ্ঠা 7

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

ঢাকা: রবিবার, ২৩ জ্যেষ্ঠ ১৩৯৪

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রবণতা ও কিছু কথা

এম জি মাইফুজ

১৯৮৭ সালের এস এস সি পরীক্ষা সম্প্রতি শেষ হয়েছে এবং জুন মাসের শেষাংশে এর ফলাফল পেতে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকগণ অধীর প্রতিক্ষায় রয়েছেন। অপরদিকে এ জুন মাসেরই ১৩ তারিখ থেকে এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সমগ্র বাংলাদেশে শুরু হচ্ছে। অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, গত কয়েক বছর যাবত এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষার বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী শহর থেকে দূর-দুরান্তরে, গ্রামাঞ্চলের ব্যাপকভাবে নকলকেন্দ্রিক কেন্দ্রসমূহের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষা বিধি বর্হিভূত পন্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ছুটাছুটি করছে। যেখানে অসদুপায় অবলম্বনের পূর্ণ ব্যবস্থা সর্বোপরি পাসের নিশ্চয়তা এমনকি শুধু পাস নয়— ডিভিশন নিয়ে কৃতিত্বের সহিত পাসের সার্বিক ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরাই অধিকাংশ টিসি নিয়ে বা না নিয়েই দলবদ্ধভাবে পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য নকলকেন্দ্রিক তীর্থ কেন্দ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে। চলতি সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিজস্ব কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকা সত্বেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীনে গত বছরের মত এবারও প্রায় ২৫টি কলেজের মাধ্যমে পাঁচশ' থেকে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার ফরম পূরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নকলের অবাধ সুযোগ গ্রহণের জন্য পরীক্ষার্থীরা আগেই এ ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের পরীক্ষার্থীরা চরম অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হয়ে সমপাঠীদের উপর কর্তৃত্ব ফলায়। ফলে, যারা সত্যিকার অর্থে ভাল ছাত্র বা মেধাবী তাদের উপর এর প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে দেখা দেয়। এ ছাড়া তারা যে স্কুল বা কলেজ থেকে নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে কলংকের মালা নিয়ে বের হয়েছিল একদিন তারাই শিক্ষকদের বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে নাজেহাল করতে দ্বিধাবোধ করে না। নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পাস করা অনেক ছাত্রকে সাবেক শিক্ষকদের বাড়ীতে পাসের খবরসহ মিষ্টি প্রেরণের মাধ্যমে অপমান করতেও দেখা যায়। বর্তমানে সরকারী স্কুল ও কলেজের নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীরা বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পূর্বেই নলককেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানমুখী হওয়ায় এসব স্কুল ও কলেজের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে কমে গেছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারী হাই স্কুল ও কলেজের প্রধানদের সাথে আলাপ করে জানা যায় পরীক্ষার অন্তর্ভুক্তি ফরম পূরণের পূর্বেই শতকরা ৬০ জন পরীক্ষার্থী ছাড়পত্র নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। কারণ সরকারী স্কুল ও কলেজে পরীক্ষার সময় নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের তেমন সুবিধা নেই। আর শতকরা ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মনেও এর প্রতিক্রিয়া দারুণভাবে প্রতিফলিত হয়। শহরের একজন প্রধান শিক্ষক আক্ষেপের সাথে জানান যে, এস এস সি নির্বাচনী পরীক্ষায় কোন ছাত্রকে নির্বাচন না করলে পূর্বের মত তারা আর কান্নাকাটি করে না। অভিভাবকগণও এর জন্য শিক্ষকদের নিকট অনুরোধ করতে আসেন না। এ ব্যবস্থাকে পরীক্ষার্থীরা হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে টিসি নিয়ে চলে যায়।

বাবার পকেটের অতিরিক্ত দু'এক হাজার টাকা খরচ হলেও তারা ঠিকই কৃতিত্বের সাথে পাস করে ফিরে আসে। এ সব অভিজ্ঞতায় পরবর্তী পর্যায়ে নিজেদের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সন্তানদের নকলকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াকে অভিনন্দন জানায়। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, এ বছরও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ, সরকারী মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, সিটি কলেজ, চাঁদপুর সরকারী কলেজ, লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ, ফেনী কলেজ, কুমিল্লা জেলা স্কুল, ফয়জুন্নেছা সরকার উচ্চ বালিকা স্কুল, ডাঃ খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারী মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজিয়েট হাইস্কুল, ফেনী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও মাতৃপীঠ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেধে নকল নামক সোনার হরিণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু এটাকে কোন শিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষ মোটেই সমর্থন করবেন না। তেমনিভাবে কোন সচেতন মানুষ জেনে-শুনে কোন সংক্রামক ব্যাধিকে নিজের দেহে সংক্রামিত করতে পারেন না।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিগত ৭/৮ বছর যাবত এ ধরনের অশুভ প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক সরকারী স্কুল ও কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। শোনা যায়, এসব স্কুল কলেজের সীমিত সংখ্যক ছাড়পত্র ইস্যু বই তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পুনঃ মুদ্রণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অতিরিক্ত একজন শিক্ষককেও দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। এ বছরের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে গত বছর ৩০ জুন তারিখ ছিল ছাড়পত্র প্রদানের সর্বশেষ তারিখ। এ সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র নেয়া না হলে নকল কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৈধভাবে ফরম পূরণ করতে ব্যর্থ হলেও এক শ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মচারীর যোগসাজশে ভুয়া টিসি তৈরী করে দু'তিন হাজার টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার অন্তর্ভুক্তি ফরম পূরণ করা সম্ভব হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তদন্তক্রমে এ সব ভুয়া ছাড়পত্রগুলো ধরা পড়লে পরীক্ষার ফলাফল বাতিল হবার সম্ভাবনা থাকে। উল্লেখ্য যে, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ গত বছর একটি বিশেষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অনুসন্ধান অভিযানে ভুয়া ছাড়পত্র ও ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষাদানের অভিযোগে প্রায় দু'হাজার এইচ এস সি ও প্রায় আড়াই হাজার এস এস সি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল বাতিল করে দেন। স্কুল ও কলেজ ত্যাগকারী এসব ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ট্রেডমার্ক প্রতিষ্ঠানগুলো রীতিমত ব্ল্যাক মেইল করছে। এদের কাছ থেকে অবৈধভাবে মোটা অংকের টাকা নিয়ে অন্তর্ভুক্তি পূরণের সুযোগ নিয়েছে।

স্কুল ও কলেজ ছুট ছাত্র-ছাত্রী, নকলকেন্দ্রিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো এবং ভবিষ্যত শিক্ষার মানদণ্ড নিয়ে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়। তাঁরা বলেন, শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের দুর্নীতি চলতে থাকলে পরীক্ষা যে শিক্ষা পরিমাপের মাপকাঠি তা কিছুতেই সংরক্ষিত হবে না। আদর্শ শিক্ষক ও ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মানসিকতার গুণাগুণ ধরে রাখা সম্ভব হবে না। পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের যে প্রচেষ্টা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের যে সাধনার পথ, সে পথে তেমন আনন্দ আর সুখ বয়ে নিয়ে আসবে না। ফলে, একদিকে যেমন শিক্ষকগণ, তেমনি অন্যদিকে ছাত্রগণ হতাশায় ভুগতে থাকবে।

এ প্রেক্ষিতে কুমিল্লা জিলা স্কুলের জনৈক শিক্ষক আক্ষেপ করে বলেন, ছাত্র-সমাজের কোন দোষ নেই, সব দোষই আমাদের। আমরা কেন তাদেরকে পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ করে দেই। কেন আমরা মাত্র কয়টা টাকার লোভে নকলের জোয়ারে ছাত্রদের মূল্যবান প্রতিভাগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছি। সরকার এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবু অনেক কেন্দ্র রয়ে গেছে। ঐ সকল শিক্ষা ধ্বংসকারী নকলকেন্দ্রিক সব পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হোক। দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে সত্যিকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া হোক। উক্ত শিক্ষক বলেন, আমরা শিক্ষক হিসেবে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে আলোর ভুবনে পৌছাতে চাই। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের শুরুতে চোর ও দুর্নীতিবাজ বানানোর কায়দা শিক্ষা দিতে চাই না। শিক্ষাঙ্গনে এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে মান-সম্মান নিয়ে শিক্ষককতা পেশায় নিয়োজিত থাকা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালের পূর্বকাল পর্যন্ত সাবেক প্রতিটি থানাভিত্তিক একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক মারপ্যাচে প্রতিটি থানায় দু'টি চারটি পর্যন্ত পরীক্ষা কেন্দ্র হয়। উপকেন্দ্র খোলা হয়। কারণ হিসেবে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র অভিভাবকদের অর্থনৈতিক সহায়তা এবং ছাত্রদের সময়ের অপচয় থেকে রক্ষা করার কথাই বলা হয়। অথচ এর সফলতা আনতে গিয়ে শিক্ষার ন্যূনতম মান রক্ষিত হচ্ছে না। শহরকেন্দ্রিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো ব্যতীত গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব কেন্দ্রগুলো নকল ব্যাধিতে আক্রান্ত। বিংশ শতাব্দিতে অত্যাধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় ফুলে-ফলে তা পল্লবিত হয়েছে। শিক্ষার আধুনিক মাপকাঠিতে সভ্যতার প্রসার আজ দিগন্তব্যাপী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশে শিক্ষার অবস্থান কোন পর্যায়ে? যে মহৎ উদ্দেশ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, বাস্তবে কি তার সে উদ্দেশ্যে পূরণ হয়েছে? দেশের এসএসসি ও এইচএসসি এবং ডিগ্রী পরীক্ষায় ১৯৭২ সালের নকলের রেকর্ড বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে ঐ সকল কেন্দ্রের নকলের প্লাবন। যে ছাত্র এস এস সি নির্বাচনী পরীক্ষায় বিষয়ে (১০ পেপার) মাত্র ৪০ নম্বর পেয়েছে, সে ছাত্র ৪৭০ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে শিক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এমনও দেখা গেছে পরীক্ষার জন্য নিরলস পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার পরিবর্তে ইংরেজী ও বাংলা ভাষা দেখে দেখে তাড়াতাড়ি লেখার অভ্যাস গড়ে তুলছে। যাতে পীরক্ষার হলে নির্ধারিত ৩ ঘন্টায় উত্তরগুলো কপি করে শেষ করা যায়। আবার একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা চায় প্রকৃত শিক্ষার আলোকে জ্ঞান সাধনা এবং মনোযোগের সাথে লেখাপড়া করে মানুষ হতে। কিন্তু নকলের অশুভ হাতছানিতে তাদের উপায় কি?

অবাধ নকলের সুযোগ রয়েছে এমন কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় তিনশ'। এর মধ্যে চট্টগ্রামের সাতুনিয়া, হাটহাজারী, মোহরা, কানুন গোপাড়া, আনোয়ারা, ওয়াজেদিয়া, কুয়াইকা, নোয়াখালীর দত্তপাড়া, চন্দ্রগঞ্জ, কুমিল্লার গুমতা, বরুড়া, চৌদ্দগ্রাম, চিওড়া, নিমসার, কচুয়া, পয়ালগাছা, গুনবতী, লালমাই, চৌয়ারা, দাউদকান্দি, দোলাই, সৈয়দাবাদ, যশোরের হাসিনপুর, খেজুরিয়া, মসিহাটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকার শ্রীনগর, লৌহজং, বৈদ্যের বাজার, শ্রীপুর প্রভৃতি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো নকলের স্বর্গভূমি হিসেবে সুপরিচিত।

সম্প্রতি হরিশ্চর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক আক্ষেপ করে বলেন, যে ছেলে ৭ বিষয়ে ফেল করায় ফরম ফিলাপের অনুমতি দেয়া হয়নি সে টিসি না নিয়েই অন্য নকলকেন্দ্রিক স্কুলের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস করে আমার বাড়ীতে মিষ্টি পাঠিয়েছে।

দেশের বিভিন্ন উপজেলায় গজিয়ে উঠা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও নকলের প্লাবনে সুদূরপ্রসারী সার্বজনীন শিক্ষা প্রসারে বিরাট হুমকি স্বরূপ। শিক্ষা ব্যবস্থা এমনিভাবে চলতে থাকলে দেশের মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে ও এর অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হবে। তাই যে সব পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অবাধে নকল চলছে সে সব কেন্দ্র সম্পর্কে নতুনভাবে ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

০